আজ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলন এবং অধিকারের আইন

কান্তি গাঙ্গুলি

রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিসাব – সারা বিশ্বের প্রায় ছ'শো মিলিয়ন অর্থাৎ ষাট কোটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধকতার শিকার। ইউনেস্কোর প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা হচ্ছেন "বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংখ্যালঘু গোষ্ঠী"। আবার এই ষাট কোটি প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির আশি শতাংশই বসবাস করেন গরিব এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।

আমাদের দেশে ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য বলছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংখ্যা শতাংশের হিসাবে ২.২১ শতাংশ। সেনসাসের এই রিপোর্ট আগাপাশতলা ত্রুটিপূর্ণ। বাস্তবে সংখ্যাটা অনেক অনেক বেশি। কেন ত্রুটিপূর্ণ, কেন সংখ্যাটা আরো ব্যাপক – সে আলোচনায় যাচ্ছি না আপাতত।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিশালসংখ্যক মানুষকে মানুষ হিসাবে স্বীকার করে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে; নাকি পুরানোদিনের মতো সমাজের বোঝা হিসাবেই গণ্য করা হবে। প্রশ্নটা অনেকদিনের, উত্তরটা অবশ্য এতটা সহজ নয়। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের ঘটনায়, রামায়ণে মন্থরার উপাখ্যানে, গণতান্ত্রিক এথেন্সের স্বর্ণযুগে, প্রাচীন মনুস্মৃতিতে এবং অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতায় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিরা যুগ যুগ ধরে চূড়ান্ত অমর্যাদার শিকার হয়েছেন। ওল্ড টেস্টামেন্ট বলেছে – প্রতিবন্ধকতা ঈশ্বরের অভিশাপ', আবার নিউ টেস্টামেন্টের মতে, 'শয়তানের দৃষ্টি'। যুগ যুগ ধরে আমাদের চিন্তাভাবনা মননে জমাট ধারণা কাঠামো হিসাবে এইভাবেই প্রতিবন্ধকতার প্রতি নেতিবাচক মনোভঙ্গি তৈরি হয়েছে। আর এটাই হচ্ছে প্রতিবন্ধকতার এক ধরনের সমাজিক নির্মাণ। অবশ্য প্রতিবন্ধকতার প্রকৃত কারণগুলিকে আজ আমরা বাস্তবসম্মতভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছি। সমাজের ব্যাপকতম অংশের মানুষের দারিদ্র্য, অপুষ্টি, অশিক্ষা, নিম্নমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রসূতি মায়েদের উপযুক্ত পরিচর্যার অভাব – এই সমস্ত সামাজিক অবস্থাকে বাদ দিয়ে প্রতিবন্ধকতার আলোচনা এককথায় অর্থহীন। পাশাপাশি, পররাজ্য গ্রাসের উদ্দেশ্যে রাসায়নিক এবং জীবাণু যুদ্ধের ভয়ংকর পরিণতি, যুদ্ধ, দুর্ঘটনা এবং সর্বোপরি গত চারশো বছর ধরে পরিবেশের উপর ভয়ংকর আক্রমণ আজ আমাদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে মানব প্রজাতির

হয়েছে, নয় তো লঘু করে দেওয়া হয়েছে। রিপ্রোডাকটিভ রাইটস, লিগ্যাল ক্যাপাসিটি, পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশনের অধিকার, প্রতিবন্ধীদের প্রতি অমর্যাদা ও অপমান বিষয়ক ধারা, নারী এবং শিশু প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রস্তাব, প্রতিবন্ধীদের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ট্রাইবুনালের বিষয়টি এই নতুন আইনের খসড়ায় হয় একেবারে বাতিল করা হয়েছে নয় গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী এবং ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম ফর দ্য রাইটস অব দ্য ডিসেবেল্ড (এন পি আর ডি)-র পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানালাম। রাজ্যসভায় বামপন্থী সংসদীয় দলের নেতা সীতারাম ইয়েচুরির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে বিলটিকে স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে আলোচনার জন্য পাঠানো হলো। আসল কথা হচ্ছে আমরা ৯৫ সালের প্রতিবন্ধী আইনের মতো আর একটি অসম্পূর্ণ কাগুজে আইন চাইনি। বরং প্রতিবন্ধীদের অধিকারের সপক্ষে বাস্তবসম্মত কার্যকর আইন পাশ হলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না। বাজেটে প্রয়োজনীয় ব্যয়-বরাদ্দসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

২০১৫ সালের মে মাসেই স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশ এসে গেছে। এবছর পাশ হয়ে গেছে মেন্টাল হেলথ কেয়ার বিল ২০১৩। ২০১৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর, আমরা সারা দেশ থেকে হাজারে হাজারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং আন্দোলনের সাথীদের নিয়ে দিল্লিতে সমাবেশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছিলাম যাতে এই বিল অবিলম্বে লোকসভায় পেশ করা হয়। এবছর ৩রা ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়ে চরমবার্তা দিতে চাই। আমাদের রাজ্যসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ গণস্বাক্ষরসহ নতুন আইনের দাবি আমরা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পৌঁছে দেব। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই যে, অবিলম্বে এই আইন লোকসভায় পেশ করুন, অন্তরে এইরকম মর্মস্পর্শী অবস্থা সারা পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ১০০ দিনের কাজ থেকে ইন্দিরা আবাসের ঘর – প্রতিবন্ধীদের কপালে ছিটেফোঁটাও জোটে না। মেন্টালি রিটার্ডেড বাচ্চাদের স্কুলের মেয়েরা কন্যাশ্রীর টাকা পান না। আমরা চিঠি দিয়ে জবাব চাইলে, আলোচনা করতে চাইলে উত্তর পাওয়া যায় না। আমরা না হয় সরকারের লোক নই, কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার পূর্বাঞ্চলের চেয়ারম্যান স্পেশাল এডুকেশনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে পান না। যতদূর শুনেছি, অপমানিত হয়ে চেয়ারম্যান ড. অশোক চক্রবর্তী পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। এরা জানেও না যে, আর সি আই পার্লামেন্ট অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে ১৯৯২ সালে গঠিত হয়েছে। এটা মন্ত্রীদের ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয় নয়, সাংবিধানিক রীতিনীতি মেনে চলাটাই সভ্য সরকারের দস্তুর। সাধারণভাবে আমরা দেখি, শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য স্পেশাল এডুকেশনের ক্ষেত্রে বিষয়টি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন বি এড (স্পেশাল এডুকেশন) ডিগ্রিধারী প্রার্থী প্রাইমারি স্কুলে চাকরি পেতেও পারেন। তবে বি এড প্রার্থীরা কোথায় চাকরি পাবেন বা আদৌ পাবেন কিনা সরকার বলতে পারছে না। আবার এম ডি ডিগ্রিধারীদের চাকরি প্রায় নেই বললেই চলে। কেউ যদি এম ফিল বা পি এইচ ডি করেন তাহলে সম্ভবত তার চাকরি পাওয়া আরো অনিশ্চিত। একটা ছোট উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষার অবস্থাটা কেমন। একবার আদালত, একবার এস এস সি দপ্তর আর একবার আর সি আই – কোথায় যাবে এরা কেউই জানেন না। মাঝে মাঝে হয়তো তারা ভাবেন, স্পেশাল এডুকেশনের জগতে এসে বুঝি অন্যায় করে ফেলেছেন। সর্বশিক্ষা অভিযানের জন্য নিযুক্ত স্পেশাল টিচারদের বেতন গত দশ বছরে এক টাকাও বাড়েনি। রিসোর্স রুমের তথাকথিত রিসোর্স হচ্ছে জলের বোতল আর পাখা। এই মহার্ঘ রিসোর্স নিয়ে অতি সামান্য বেতনে বিশেষ শিক্ষকরা একটা ব্লকের সমস্ত স্কুলগুলিতে ভিজিট করবেন এবং হোম সার্ভিসও দেবেন – আমরা এমনটা আশা করি। আমাদের রাজ্য সরকারের তথাকথিত জনমোহিনী প্রকল্পের অভ্যন্তরে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিরা

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, সন্দিহান করে তুলেছে আমাদের সামগ্রিক অস্তিত্ব নিয়েই।

তাহলে বক্তব্য দাঁড়ালো এই যে, প্রতিবন্ধকতা শুধুমাত্র ব্যক্তিটির ব্যক্তিগত সমস্যা বা পারসোন্যাল ট্র্যাজেডি নয়, বরং এর একটা সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষিত আছে এবং ‘কল্যাণ সাধনের মহৎ ব্রত’ প্রতিবন্ধকতার এই সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের বিতর্ককে কখনোই সমাধান করতে পারবে না। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আন্দোলন তাই সোস্যাল মডেল থেকে পলিটিক্যাল মডেলের দিকে অগ্রসর হতে চাইছে। আবেগায়িত অতিকথনের ভাসা ভাসা ধারণা থেকে খুব সুনির্দিষ্টভাবে নাগরিক অধিকার, আইনি অধিকার এবং বৃহত্তর অর্থে মানবাধিকারের ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করতে চাইছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত সনদ (ইউ এন সি আর পি ডি-২০০৬) এই আন্দোলনের অন্যতম প্রত্যয়। দয়া, মায়া, অনুকম্পা, করুণা এমনকি কল্যাণ সাধনের জন্য তথাকথিত দানও তত্ত্বগতভাবে প্রতিবন্ধীরা আর যেন গ্রহণ করতে চান না। চান অপরাপর প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষের মতোই অধিকার। ইতিপূর্বে গৃহীত আর সি আই অ্যাক্ট (১৯৯২), প্রতিবন্ধী আইন (১৯৯৫), ন্যাশনাল ট্রাস্ট অ্যাক্ট (১৯৯৯) এবং মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট (১৯৮৭)-কে আন্তর্জাতিক সনদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তন করতে হবে এবং সেই জন্যই চাই প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত নতুন আইন। এই দাবি নিয়ে আমরা ২০১০ সালে দিল্লি অভিযান করেছিলাম। আমাদের দাবি মেনে নিয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ড. সুধা কলের নেতৃত্বে নতুন আইনের খসড়া তৈরি করার জন্য কমিটি গঠন করে। দু-দু'বার এই খসড়া পরিমার্জিত হয়ে ২০১৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভায় পেশ হয় এবং এই আইনের খসড়াটিই হচ্ছে আর পি ডি-বিল, ২০১৪। নতুন আইনের দাবিতে আমরা বিগত ছয় বছর ধরে লাগাতার আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করেছি। অথচ আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে, ড. সুধা কল কমিটির খসড়া রিপোর্ট থেকে প্রস্তাবিত বিলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশকে হয় একেবারে ছেঁটে ফেলা চেয়েছিলাম। প্রতিবন্ধী আন্দোলনের কয়েকটি কেন্দ্রীয় গ্রুপ বিভ্রান্ত হলেন। তারা এমননকি সি পি আই (এমন)-র কেন্দ্রীয় দপ্তর এ কে গোপালন ভবনের সামনে বিক্ষোভ পর্যন্ত দেখালেন। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করেছে আমরা সঠিক পথে ছিলাম।

আমরা প্রতিবন্ধকতার সামগ্রিক বিষয়টি নিয়ে শুধু সংসদেই নয়, বরং সমাজের সর্বস্তরেই আলোচনা চাই। আমরা চাইনি '৯৫ সালের প্রতিবন্ধী আইন পাশের মতো সবাই বুঝে না বুঝে হাত তুলে দিক। বরঞ্চ সংসদে আলোচনা হোক, আইনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটি সুনির্দিষ্ট মতামত দিক। বিতর্ক থাকবে, বিতর্ক আছে; সজীব সচল বিতর্কই আমরা চাই। দেশের মানুষের বৃহত্তম অংশ অর্থাৎ ছাত্র-যুব, শ্রমিক, কৃষকদের, নারী আন্দোলনের কর্মীদের ভাবাতে হবে। আসল কথা হচ্ছে, প্রতিবন্ধকতার সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা হিসাবে না ভাবতে পারলে সব আইনই কাগুজে আইন হয়ে থাকবে – এই সার কথাটা বোঝা দরকার। উদাহরণ – সমবায় ভাবনা, সাক্ষরতা আন্দোলন, নারী সশক্তিকরণ, অপারেশন বর্গা, গ্রন্থাগার আন্দোলন ইত্যাদি। উদাহরণ – পালস্ পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি। ১৯৯৫ সাল আমাদের দেশে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে সরকারি, বেসরকারি, মিডিয়া, স্বয়ংশাসিত বিভিন্ন সংস্থাকে যুক্ত করে জনগণের বৃহত্তম অংশকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা সম্ভব হয়েছিল। যার ফলে ২০১৩-তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতকে পোলিওমুক্ত দেশ হিসাবে ঘোষণা করে। অর্থাৎ ইনক্লুসিভ এডুকেশনই হোক আর বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রকল্পই হোক, সমাজের উপরতলা থেকে নিচেরতলা সবাইকে বিতর্কে যুক্ত করতে পারলে তবেই পলিসি আর প্র্যাক্টিসের মেলবন্ধন ঘটে।

আমরা সঠিক পথেই ছিলাম, আজ প্রমাণিত। প্রতিবন্ধীদের ১৯টি কেন্দ্রীয় সংগঠন এন পি আর ডি'র সঙ্গে যৌথভাবে, নতুন আইনের খসড়া স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশসহ লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে পাশের দাবিতে ৩রা ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে দিল্লিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছে। মনে রাখতে হবে, শুধু আইন নতুবা প্রয়োজন হলে আগামীদিনে আমরা দিল্লিতেই আইন অমান্য আন্দোলন করে আরো ব্যাপক আন্দোলন সংগ্রামে শামিল হবে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী অবশ্য চাল-চলনে-বচনে-কথনে সবসময়ই একটা নাটকীয়তা বজায় রাখতে ভালোবাসেন। ইতিমধ্যেই তিনি বিশ্ব রেকর্ড করে বসে আছেন। গুজরাটে প্রতিবন্ধীদের সহায়ক সরঞ্জাম বিতরণের এক শিবিরে তিনি নাকি আশি হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ট্রাইসাইকেল, হুইলচেয়ার এইসব দিয়েছেন, আর এভাবেই তিনি বিশ্বের সর্ববৃহৎ শিবির করে গিনেস বুকে নাম তুলেছেন। এই শিবিরের পেছনের রাজনীতিটা অবশ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ভালোই বোঝেন। একদিকে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত নতুন আইন নিয়ে টালবাহানা করছেন, অন্যদিকে আশি হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ট্রাকে করে তুলে নিয়ে গিয়ে সরকারি অর্থে দানধ্যান করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হয়তো ভাবেন ব্যক্তিটি প্রতিবন্ধী বলেই হয়তো তার কোনো ডিগনিটি থাকতে পারে না! প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আপনার কাছে থেকে দানধ্যানের অনুকম্পা চায় না, বরং অধিকার চায়, মর্যাদা চায় এবং সেই জন্যই দানধ্যানের রাজনীতি ছেড়ে আপনি নতুন আইনের খসড়া লোকসভায় অবিলম্বে পেশ করুন এবং সেটাই হবে কাজের কাজ।

আমাদের রাজ্যে প্রতিবন্ধীরা এককথায় ভালো নেই এবং শুধু ভালো নেই তা নয়, দিন দিন অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এক দিনে সাতশো আটশো ফলক উন্মোচন করে ‘উন্নয়নের বন্যা’ বইয়ে দিচ্ছেন। এর মধ্যে অবশ্য বিধায়ক কোটার টাকায় রাস্তা সারাই কিংবা কল বসানোর কাজও থাকে। কিন্তু তাঁর ‘অনুপ্রেরণায়’ ক্লাবগুলো বছর বছর নগদ টাকা পেলেও গত ছয় বছরে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটাও স্পেশাল স্কুল তৈরি হয়নি। ছাত্রবৃত্তি এক পয়সাও বাড়েনি। প্রতিবন্ধী ভাতার অবস্থা শুনলে গলার কাছে যন্ত্রণা দলা পাকিয়ে উঠবে। একজন আশি শতাংশ প্রতিবন্ধীকে ভাতা পেতে হলে প্রাপক তালিকার একজন প্রতিবন্ধীর মৃত্যু কামনা করতে হবে। কারণ ভাতা প্রাপকদের সংখ্যা একটাও বৃদ্ধি পায়নি। কল্যাণমূলক কোনো প্রকল্পের চাই পান না। কারণ রাজ্য সরকারের কাছে তারা মানুষই না, বরং অব-মানব রূপে একটা আলাদা বর্গ। আর সেজন্যই পাকা দোতলা বাড়ির মালিকের বি পি এল কার্ড থাকলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সিংহভাগই সুপ্রিম কোর্টের রায় সত্ত্বেও বি পি এল তালিকার বাইরে।

আমাদের রাজ্য থেকেই প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আন্দোলন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করেছে – আমাদের কাছে এটা খুবই গৌরবের বিষয়। এবছরও প্রায় ১২০০ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি এবং তাদের আন্দোলনের সাথীরা অনেক দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করে এই প্রবল শীতের মধ্যেও দিল্লির রাজপথে উপস্থিত হয়েছেন। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আন্দোলনের একজন কর্মী হিসাবে আজ ভাবতে ভালো লাগে পুরানো দিনের কথাগুলো। মনে পড়ে আমাদের প্রয়াত সাথীদের কথা। প্রায় তেত্রিশ বছর আগে একটা ছোট্ট সংগঠন যখন আমরা গড়ে তুলতে হাত লাগিয়েছিলাম, তখন কি আমরা ভাবতে পেরেছিলাম প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আন্দোলনের রাজনৈতিক, সামাজিক, দার্শনিক ভিত্তির ব্যাপ্তি এতটা গভীর হতে পারে। চলতে চলতে আজ অনেকটা পথ আমরা পেরিয়ে এসেছি, সর্বভারতীয় স্তরে অপরাপর প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের সংগঠন এবং তাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। আজ আমরা বুঝতে পারছি, অধিকারের আন্দোলনের পথে শেষ বলে কোনো গন্তব্য থাকে না। একটা পেলে আরেকটা চাই। এটাই হচ্ছে অধিকারের আন্দোলনের গল্প। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আন্দোলনের অন্যতম প্রেরণা সাধন গুপ্ত, আমাদের সকলের প্রিয় সাধনদা'র এবছর জন্মশতবর্ষ পালিত হবে। সাধন'দার জন্মশতবর্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের আইন কার্যকর হলে তা এক ঐতিহাসিক সমাপতন হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আন্দোলন বহুমুখী সংগ্রামশীল মানব চরিত্রের যে ব্যাপ্ত বৈচিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে, আমরা বামপন্থী আন্দোলনের কর্মীরাও কি সেখান থেকে কিছু শিখতে চাইছি – এই প্রশ্নটা রেখেই বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে।

Close
Print